স্থানীয় সরকার বিষয়ে সাম্প্রতিক সরকারি সিদ্ধান্ত ও নাগরিক ভাবনা

ড. বদিউল আলম মজুমদার, সম্পাদক, সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক (২৯ ডিসেম্বর ২০১১)

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় বর্তমানে একটি হ-য-ব-র-ল অবস্থা বিরাজ করছে। যদিও ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানে একটি স্বায়ত্তশাসিত ও শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার রূপরেখা প্রদান করা হয়েছে, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে, বিশেষত গত ২০ বছরের নির্বাচিত সরকারের আমলে কোটারি স্বার্থে এ ব্যবস্থাকে ক্রমাগতভাবে দুর্বল করা হয়েছে। বস্তুত, বর্তমানে আমাদের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো বহুলাংশে অকার্যকর হয়ে পড়েছে। বর্তমান সরকারের কিছু অর্বাচীন পদক্ষেপ এ অবস্থাকে আরও ত্বরান্বিত করেছে। সরকারের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত এবং এগুলো সম্পর্কে নাগরিক ভাবনা তুলে ধরাই এ নিবন্ধের লক্ষ্য।

উপজেলা নিয়ে উদ্ভট সিদ্ধান্ত

স্মরণ করা যেতে পারে যে, গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে জারি করা *স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) অধ্যাদেশ, ২০০৮* অনুমোদন না করে, নবনির্বাচিত মহাজোট সরকার গত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে, ১৯৯৮ সালে, প্রণীত উপজেলা পরিষদ আইনটি সংশোধিত আকারে পুনঃপ্রচলন করে। দিনবদলের সনদে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার অঙ্গীকারের প্রেক্ষিতে *উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮* পুনঃপ্রচলন ছিল সরকারের জন্য একটি মারাত্মক ভুল সিদ্ধান্ত।

১৯৯৮ সালের আইনটির দুর্বলতা সম্পর্কে আমাদের বর্তমান মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত তাঁর ২০০২ সালে প্রণীত *জেলায় জেলায় সরকার* গ্রন্থে লিখেছেন:

> “উপজেলায় অর্থাৎ থানায় সেই ১৯৬১ সাল থেকে একটি কাযর্করী প্রশাসনিক কাঠামো স্থাপনের কাজ শুরু হয়। ১৯৮২-৮৩ সালে উপজেলা পরিষদ সৃষ্টিতে এই কাঠামো আরো শক্তিশালী হয়। এই কাঠামো বতর্মানে কেন্দ্রীয় সরকারের নিু্তম স্তর বলে বিবেচিত হতে পারে। এই কাঠামোর মূল্যায়ন, তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন অত্যন্ত দুর্বল ও শ্লথ। এই কাঠামোকে সত্যিকারভাবে ব্যবহারের জন্য একে স্থানীয় শাসনের অংশীভূত করা উচিত ছিল। সেজন্য প্রয়োজন হলো দায়িত্বশীল ও স্বয়ম্ভর জেলা বা উপজেলা সরকার। তার কোন চিন্তাভাবনা বতর্মান আইনে রূপলাভ করেনি। সৌভাগ্যের বিষয় যে দু’বছরেও এই পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এই ঠুঁটো জগন্নাথ পরিষদকে ঢেলে সাজাতে হবে এবং সেই সুযোগটি এখনই হাজির হয়েছে।” পৃ. ২১৯

দুর্ভাগ্যবশত মহাজোট সরকার কর্তৃক আইনটি ২০০৯ সালে পুনঃপ্রচলনের সময়ে সে সুযোগটি গ্রহণ করা হয়নি। ফলে ২০০৯ সালের উপজেলা নির্বাচনের মাধ্যমে সত্যিকারার্থেই একটি ঠুঁটো জগন্নাথ তথা অকার্যকর উপজেলা পরিষদ গঠিত হয়। উপজেলা পরিষদ অকার্যকর হওয়ার প্রধান কারণ হলো মাননীয় সংসদ সদস্যদেরকে উপজেলা পরিষদের উপদেষ্টা করে তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ পরিষদের জন্য বাধ্যতামূলক করা। একইসঙ্গে সংসদ সদস্যদের অনুমতি ব্যতিরেকে পরিষদের পক্ষ থেকে সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। বস্তুত, এর মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের ওপর সংসদ সদস্যদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং এটিকে তাঁদের পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়, যা আমাদের সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

আমাদের সংবিধানের ৫৯(১) অনুচ্ছেদে ‘আইনানুযায়ী’ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর স্থানীয় শাসনের ভার প্রদানের কথা বলা রয়েছে। প্রশাসন ও সরকারি কমর্চারীদের কার্য, জনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং জনকল্যাণমূলক সকল সরকারি সেবা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন স্থানীয় সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিরাই আইনানুযায়ী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনার জন্য নির্বাচিত। পক্ষান্তরে সংসদ সদস্যগণ, সংবিধানের ৬৫(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, আইনপ্রণয়নের জন্য নির্বাচিত। আর সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদে বলা আছে যে, প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং সংশ্লিষ্ট সকলে জনগণের পক্ষে শুধু সংবিধানপ্রদত্ত ক্ষমতাই প্রয়োগ করবে। তাই সংসদ সদস্যদেরকে উপজেলা পরিষদের কর্তৃত্ব প্রদান সংবিধানের ৫৯ ও ৬৫ অনুচ্ছেদের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। এছাড়াও এর মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে একটি দ্বন্দ্বাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

সংসদ সদস্যদের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান পরিচালনা তথা স্থানীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সংসদ সদস্যদের জড়িত হওয়ার বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতের সুস্পষ্ট রায়ও রয়েছে। *আনোয়ার হোসেন মঞ্জু বনাম বাংলাদেশ* [১৬বিএলটি(এইচসিডি)(২০০৮)] মামলায় জেলামন্ত্রীর পদ অসাংবিধানিক বলে ঘোষণা সম্পর্কিত রায়ে বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক ও বিচারপতি এটিএম ফজলে কবীর বলেন:

> “মন্ত্রী, হুইপ এবং অন্যান্য কর্মকর্তা, যাঁদের কথাই উপরিউক্ত প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের কাউকেই উল্লেখিত কোনো জেলার জন্য নিয়োগ প্রদান করা যায় না। সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী হিসেবে সকল দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য দায়িত্ব ব্যতীত জেলাগুলোতে তাঁদের অন্য কোনো দায়-দায়িত্ব নেই। একইভাবে সংসদ সদস্যদেরও জেলা বা অন্যান্য প্রশাসনিক একাংশে উন্নয়ন বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে কোন ভূমিকা ও দায়িত্ব নেই। অতএব মামলার বাদী, যিনি একজন সংসদ সদস্য, পিরোজপুর জেলা সম্পর্কে তাঁর কোন দায়দায়িত্ব নেই।” [১৬বিটিএল(এইচসিডি)২০০৮]

অর্থাৎ সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য নির্ধারিত স্থানীয় উন্নয়ন, জনশৃঙ্খলা রক্ষা ও জনসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যদের সম্পৃক্ত হওয়া সংবিধান পরিপন্থী। জনশৃঙ্খলা রক্ষা ও জনসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যদের সম্পৃক্ত হওয়া সংবিধান পরিপন্থী।

পুনঃপ্রচলিত উপজেলা আইনটি কোটারী স্বার্থে প্রণীত একটি‘কালারেবল লেজিসলেশন বা রঙ্গিন আইন। যা প্রত্যক্ষভাবে করা যায় না, আইনপ্রণয়ন করে তা পরোক্ষভাবে করলে, সে আইনকে রঙ্গিন আইন বলা হয়। সংসদ সদস্যগণ তাঁদের সংসদীয় দায়িত্ব পালনের জন্য নির্বাচিত। আইন করে তাঁদেরকে উপজেলা কর্তৃত্ব গ্রহণের দায়িত্ব দিলে, সে আইন অবশ্যই রঙ্গিন আইন। এছাড়াও *কুদরত-ই-এলাহী পনির বনাম বাংলাদেশ* [৪৪ ডিএলআর (এডি)(১৯৯২)] মামলার রায় অনুযায়ী, সংসদ স্থানীয় সরকার বিষয়ে আইনপ্রণয়নকালে সংবিধানের ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদকে উপেক্ষা করতে পারে না।

১৯৯৮ সালের উপজেলা আইনকে পুনঃপ্রচলন করার বিরুদ্ধে আরেকটি বড় যুক্তি হলো, এর মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের ওপর আমলাতন্ত্রের খবরদারি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। আইনের ৫০ ও ৫১ ধারায় উপজেলা পরিষদের কার্যক্রমের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সরকারি কর্মকর্তাদের ওপর প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া আইনে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ক্ষমতা খবর্কারী আরও অনেক বিধান রয়েছে, যা স্বায়ত্তশাসিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ধারণার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়।

গত ২৯ নভেম্বর তারিখে জাতীয় সংসদ ২০০৯ সালে পুনঃপ্রচলিত উপজেলা আইনটিকে সংশোধন করে। মোটা দাগে এ সংশোধনের মাধ্যমে উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে উপজেলা পরিষদের মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পরিষদের পরিবর্তে উপজেলা চেয়ারম্যানকে নির্বাহী ক্ষমতা প্রদান এবং ষ্ট্যান্ডিং কমিটির সংখ্যা বাড়িয়ে পরিষদের দুই ভাইস চেয়ারম্যানকে সকল ষ্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি করা হয়। সংশ্লিষ্ট সবাইকে সন্তুষ্ট করার লক্ষে আইনে এসব পরিবর্তন আনা হলেও, এর মাধ্যমে বিরাজমান সমস্যার কোন সমাধান হবে না বলেই আমাদের বিশ্বাস। বরং এর মাধ্যমে সমস্যা আরো প্রকট হবে।

সংশোধনীটি পাশ করার আগে উপজেলা পরিষদে মূলত সংসদ সদস্য ও উপজেলা চেয়ারম্যান/ভাইস চেয়ারম্যানদের সঙ্গে একটি দ্বিমূখী ক্ষমতার দ্বন্দ্ব বিরাজমান ছিল। বতর্মানে এটি একটি ত্রিমূখী দ্বন্দ্বে পরিণত হয়েছে। এছাড়াও সংশোধনীর মাধ্যমে পুনঃপ্রচলিত আইনের ৩৩ ধারায় বর্ণিত ‘উপজেলা নির্বাহী অফিসার পরিষদের সচিব হইবেন এবং তিনি পরিষদকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবেন পরিবর্তন করেউপজেলা নির্বাহী অফিসার পরিষদে নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন এবং তিনি পরিষদকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবেন’ করা হয়েছে। অর্থাৎ মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা পদ দিয়ে তাঁকে পরিষদকে সাচিবিক সহায়তা প্রদানের, পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও আর্থিক শৃঙ্খলা প্রতিপালনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এ সকল পরিবর্তন অনেকাংশে পরস্পর বিরোধী এবং কোনো সুস্পষ্ট অর্থ বহন করে না।

পুনঃপ্রচলিত আইনে সংশোধনী এনে উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যানদেরকে সকল ষ্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি করার মাধ্যমে এমন ধারণা দেওয়া হয়েছে যে, এর ফলে ভাইস চেয়ারম্যানগণ ব্যাপকভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হলেন। দুর্ভাগ্যবশত এমন ধারণা প্রদান সংশ্লিষ্টদের চোখে ধূলা দেওয়ার শামিল। কারণ ষ্ট্যান্ডিং কমিটির কোন নির্বাহী ক্ষমতা নেই এবং এসব কমিটির সুপারিশসমূহ মূলত পরামর্শমূলক। এছাড়াও ভাইস চেয়ারম্যানদেরকে সকল ষ্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি করার ফলে পরিষদের অন্যান্য সদস্যগণকে বঞ্চিত করা হলো। উপরন্তু, সকল ভাইস চেয়ারম্যানদের সব কমিটি পরিচালনার দক্ষতা না থাকারই কথা। আর উপজেলা পরিষদ যেখানে অকার্যকর, সেখানে কমিটিগুলো কার্যকর হবার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।

জেলা পরিষদ গঠন নিয়ে ‘স্বেচ্ছাচারিতা’

গত ১৫ ডিসেম্বর রাতে, বিজয় দিবসের প্রাক্কালে, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে প্রণীত *জেলা পরিষদ আইন*, ২০০১-এর ৮২ ধারার অধীনে সরকার ৬১টি জেলায় দলীয় কিংবা অঙ্গ সংগঠনের নেতাদের মধ্য থেকে প্রশাসক নিয়োগ দিয়েছে। প্রশাসক নিয়োগ, এমনকি আইনটির উপযোগিতা সম্পর্কে ইতিমধ্যে অনেক গুরুতর প্রশ্নের জন্ম হয়েছে। আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী তাঁর *জেলায় জেলায় সরকার* বইটিতে লিখেছেন:

> “জেলা পরিষদ সম্বন্ধে আর একটি ব্যবস্থা আছে যা অত্যন্ত গর্হিত। সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠান না করেই নিজেদের মনোনীত ব্যক্তিকে দিয়ে জেলা সরকার গঠন করতে পারে। এ ধরনের স্বেচ্ছাচারিতা বা স্বজনপ্রীতির (সম্ভবত দলীয় প্রীতি) কোন সুযোগ একটি গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানে থাকা নিতান্তই লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয়। জেলা পরিষদের নির্বাচন এই আইনে আজও হয়নি। এই আইনটি রহিত করে নতুন করে আইন প্রণয়ন হবে নতুন জাতীয় সংসদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কতর্ব্য।” পৃ. ২৫৯

এছাড়াও আইনটি বাস্তবায়িত হলে একটি অথর্ব জেলা পরিষদ গড়ে উঠবে বলে তিনি দাবি করেন। পৃ. ৬১ আইনে জেলা পরিষদে প্রশাসক নিয়োগের নিয়ে আদালতে মামলাও হয়েছে। ২০০০ সালে আইনটি পাশের পর তৎকালীন সরকার অনির্বাচিত ব্যক্তিদেরকে প্রশাসক পদে নিয়োগের উদ্যোগ নিলে সংসদ সদস্য এডভোকেট খায়রুল আনাম আইনের ১৭ (নির্বাচকমণ্ডলী সংক্রান্ত) এবং ৮২ ধারা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে একটি রীট আবেদন করেন। বিচারপতি মাইনুর রেজা চোধুরী (পরবর্তী সময়ে প্রধান বিচারপতি) ও বিচারপতি মোঃ মোজাম্মেল হোসেন (বর্তমান প্রধান বিচারপতি) সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ সরকারের প্রতি রুল জারি করেন, যা আজও নিস্পত্তি হয়নি। বাদীর আইনজীবির প্রশাসক নিয়োগর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত বলেন, “আশাকরি এই রুলের পর সরকার প্রশাসক নিয়োগের উদ্যোগ নেবে না। যদি নেয় তবে সম্পূরক আবেদন নিয়ে আসবেন, আমরা তখন বিষয়টি দেখব” (ইত্তেফাক, ১৭ ডিসেম্বর ২০১১)। যদিও আদালতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার জেলা পরিষদে প্রশাসক নিয়োগ থেকে বিরত থাকে, কিন্তু বর্তমান মহাজোট সরকার তা করতে সামান্যতমও কুণ্ঠাবোধ করেনি।

জেলা পরিষদে দলীয় প্রশাসক নিয়োগের বিরুদ্ধে আরও অনেকগুলো যৌক্তিক কারণ রয়েছে। **প্রথমত**, এটি আমাদের সংবিধানের নগ্ন লঙ্ঘন। একইসঙ্গে এটি আমাদের উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্তেরও পরিপন্থী। এছাড়া এর মাধ্যমে জেলা পর্যায়ে একটি চরম দ্বন্দ্বাত্বক পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে বলে আমাদের আশঙ্কা। আর যেখানে দ্বন্দ্ব ও হানাহানি, সেখানে ইতিবাচক ও গঠনমূলক কিছু হয় না। আমাদের সংবিধানের ৫৯(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, “আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে।” অর্থাৎ সাংবিধানিক নির্দেশনা অনুসারে নির্বাচিত জেলা পরিষদ জেলায়, নির্বাচিত উপজেলা পরিষদ উপজেলায়, নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদ ইউনিয়ন, নির্বাচিত সিটি করপোরেশন সিটিতে এবং নির্বাচিত পৌর পরিষদ পৌরসভায় শাসন কার্য পরিচালনা করবে। অনির্বাচিত ব্যক্তি বা প্রশাসকের কোনোরূপ ভুমিকা পালনের সুযোগ সংবিধানে রাখা হয়নি। এছাড়াও *কুদরত-ই-এলাহী পনির বনাম বাংলাদেশ* মামলায় বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট অনির্বাচিত ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানকে স্থানীয় সরকার হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন। তাই জেলা পরিষদ বা অন্য কোনো স্থানীয় সরকার আইনে অনির্বাচিত প্রশাসক নিয়োগ করার বিধান সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। আর এ অসাংবিধানিক বিধানের অধীনে প্রশাসক নিয়োগ প্রদানও অসাংবিধানিক হতে বাধ্য।

দ্বিতীয়ত, অনেকেরেই স্মরণ আছে যে, কুদরত-ই-এলাহী পনির বনাম বাংলাদেশ মামলার ১৯৯২ সালে প্রদত্ত রায়ে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ এক সর্বসম্মত রায়ে বলেন: “সংবিধানের বিশেষ প্রতিনিধিত্ব সংক্রান্ত ৯ অনুচ্ছেদের আলোকে নির্বাচনের মাধ্যমে অনির্বাচিত ব্যক্তিদের বাদ দিয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে ৫৯ অনুচ্ছেদর সঙ্গে সমাঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে। এ বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ যথাশীঘ্রই নিতে হবে – তবে কোনো অবস্থায়ই যেন এ সময় এখন থেকে ছয় মাসের বেশি না হয়।” ১৯৯২ সালে দেওয়া দেশের সর্বোচ্চ

আদালতের রায় আজও বাস্তবায়িত হয়নি এবং জেলা পরিষদের প্রশাসক নিয়োগ করা হয়েছে এ রায় উপেক্ষা করেই। এর ফলে সরকার আদালত অবমাননা করেছে কিনা এ নিয়ে অনেকের মনেই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

বিদ্যমান আইনে জেলা পরিষদের জন্য পরোক্ষ নির্বাচনের বিধান রয়েছে। আইনের ১৭(১) ধারা অনুযায়ী, জেলার আওতাভুক্ত সকল নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের নিয়ে জেলা পরিষদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হবে। নির্বাচন কমিশন এসব নির্বাচকদের নাম অন্তর্ভুক্ত করে প্রত্যেক ওয়ার্ডের জন্য একটি ভোটার তালিকা তৈরি করবে। আর আইনের ৪ ধারা মোতাবেক এসব ভোটারগণ তাদের ভোটের মাধ্যমে জেলা পরিষদের জন্য একজন চেয়ারম্যান, ১৫ জন সদস্য ও সংরক্ষিত আসনের জন্য পাঁচজন মহিলা সদস্য নির্বাচিত করবেন। বলা বাহুল্য যে, গত বছর অনুষ্ঠিত পৌরসভা নির্বাচন এবং এবারের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের পর নবনির্বাচিতদেরকে নিয়ে নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করে জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের এক অপূর্ব সুযোগের সৃষ্টি হয়েছে।

আইনের বিধানানুযায়ী জেলা পরিষদ নির্বাচনের জন্য গড়ে হাজার দেড়েক নির্বাচক নিয়ে ভোটার তালিকা তৈরি হওয়ার কথা। ফলে এ নির্বাচনটি সম্পন্ন করা সরকারের পক্ষে অত্যন্ত সহজ কাজ ছিল। তাই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখার স্বার্থে কেন সরকার এ উদ্যোগটি গ্রহণ করল না তা আমাদের কাছে বোধগম্য নয়। তাহলে সরকারের কি কোনো দূরভিসন্ধি রয়েছে?

তৃতীয়ত, নতুন জারি করা প্রজ্ঞাপনটি এবং *জেলা পরিষদ আইন, ২০০০* একত্রে দেখলে যেকোনো বিশ্লেষকের মনেই সন্দেহ সৃষ্টি না হয়ে পারে না। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী নব নিযুক্ত প্রশাসকগণের নিয়োগের মেয়াদ এবং জেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কোনো সময়সীমা নির্দিষ্ট করা নেই। এমনকি আইনের প্রশাসক সম্পর্কিত ৮২ ধারায় প্রশাসকের মেয়াদকাল এবং নিয়োগের কত দিনের মধ্যে নির্বাচন হতে হবে তাও বলা নেই। তাই দলীয় বিবেচনায় ও ফায়দা প্রদানের লক্ষে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রশাসকগণ অনির্দিষ্টকালের জন্য 'জেলা পরিষদের কার্যাবলী সম্পাদন' করে যেতে পারেন। নিঃসন্দেহে এ ধরনের দলীয়করণ এ অবস্থা আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করানো এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে না। এছাড়াও ক্ষমতাসীন দলের জন্যও এটি কোনো ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে না বলে আমাদের আশঙ্কা।

চতুর্থত, গণতন্ত্র হল জনগণ তথা তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শাসন। শুধুমাত্র নির্বাচিত সংসদ থাকলেই গণতন্ত্র হয় না। এর জন্য আরও প্রয়োজন জেলাসহ প্রশাসনের সর্বস্তরে জনপ্রতিনিধিদের শাসন। আর নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গণতন্ত্র গভীরতা অর্জন করে এবং প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়। তাই জেলায় প্রশাসক নিয়োগের মাধ্যমে ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক শক্তির বিকাশের পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হল, ফলে গণতন্ত্রের 'স্পেস' কমে গেল। এছাড়াও নির্বাচন ছাড়া স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান 'গঠিত'ই হয় না, আর জেলা পরিষদ যদি গঠিতই না হয়, তাহলে এটি শক্তিশালী হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

পঞ্চমত, জেলা পরিষদের মত একটি বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান দলীয়করণের মাধ্যমে একটি অত্যন্ত খারাপ দৃষ্টান্তও স্থাপিত হল। এ নিয়োগ জায়েজ হয়ে গেলে ভবিষ্যতের কোনো সরকার মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার পর নির্বাচন না করে যদি প্রত্যেকটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে দলীয় ব্যক্তিদেরকে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দিয়ে দেয়, তাহলে সে সরকারকে কে রুখবে! আমাদের বিরাজমান রাজনৈতিক অপসংস্কৃতিতে এমন অর্বাচীন সিদ্ধান্তের কথা একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে এমন সিদ্ধান্ত হবে আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য কবর খোঁড়ার সামিল। এছাড়াও দলীয় ব্যক্তিদেরকে নিয়োগ প্রদান আমাদের নীতি নির্ধারকদের শপথেরও বরখেলাপ, কারণ তাঁরা 'ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী' হয়ে আচরণ না করতে শপথ নিয়েছেন। এছাড়াও বরখেলাপ হল 'সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান' সম্পর্কিত শপথ।

ষষ্ঠত, জেলা পরিষদকে দলীয়করণের এ সিদ্ধান্তে ক্ষমতাসীন দলও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্তদের সঙ্গে বঞ্চিতদের দ্বন্দ্ব সারা দেশে এরই মধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে (*মানবজমিন*, ১৬ ডিসেম্বর ২০১১)। এছাড়াও এর মাধ্যমে জেলা পরিষদগুলো দলবাজির আখড়ায় পরিণত হতে পারে, যা সরকারের জন্য ভবিষ্যতে বদনামের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। ফলে দলীয় প্রশাসকের মাধ্যমে আগামী নির্বাচন প্রভাবিত করার সম্ভাব্য প্রচেষ্টা বুমেরাং হতে পারে। উপরন্তু বিদ্যমান আইনের ৩০ ধারায় মাননীয় সংসদ সদস্যদের জেলা পরিষদের উপদেষ্টা করার বিধান রয়েছে। তাই প্রশাসক নিয়োগের কারণে উপজেলার মত জেলা পর্যায়েও একটি ত্রিমুখী দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হবে, যার পরিণতি অমঙ্গলকর হতে বাধ্য।

এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে, সরকার অনির্বাচিত ব্যক্তিদের শাসন বিলুপ্ত করার লক্ষে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে গত জুলাই মাসে, সুপ্রিম কোর্টের আরও দুই টার্মের জন্য এটি রাখার পর্যবেক্ষণ উপেক্ষা করে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে। কিন্তু বছরের শেষে এসে সরকার নিজেই নির্বাচনের পরিবর্তে জেলা পরিষদে অনির্বাচিত প্রশাসক নিয়োগ দিয়েছে, যার ফলে সরকার তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে। কিন্তু বিশ্বাসযোগ্যতা ও জনগণের সমর্থনই সরকারের ক্ষমতার মূল উৎস।

ঢাকা সিটি করপোরেশন নিয়ে তুঘলকি কাণ্ড

গত ২৯ নভেম্বর তারিখে সরকার *স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন*, ২০০৯-এর সংশোধনকল্পে জাতীয় সংসদে একটি বিল পাশ করেছে। বিলটির মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীকে 'ঢাকা উত্তর' ও 'ঢাকা দক্ষিণে' বিভক্ত করা হয় এবং পরবর্তীতে দুইজন সরকারি কর্মকর্তাকে এগুলোর প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়, যা ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়।

ঢাকা মহানগরকে বিভক্ত করার সিদ্ধান্তের সমর্থনে সরকারের পক্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি যুক্তি দেওয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে যে, জনসংখ্যার চাপ ও দুর্নীতির কারণে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এর মাধ্যমে করপোরেশনের সেবার পরিমাণ ও মান বৃদ্ধি পাবে। এ যুক্তিগুলো একটু গভীরভাবে খতিয়ে দেখা দরকার।

জনসংখ্যার চাপের বিষয়ে আসা যাক। বহুকাল থেকেই ঢাকা শহরের ওপর জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর এর ফলেই ঢাকা শহর মহানগরে পরিণত হয়েছে। অব্যাহতভাবে জনগণের ঢাকামুখী হবার পেছনে মূলত দু'টি কারণ রয়েছে। প্রথমত, আমাদের কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা। আমাদের দেশে কেন্দ্র তথা ঢাকা থেকেই সবকিছু পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রায় সব অফিস-আদালতই ঢাকায় অবস্থিত। তাই সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বিরাট অংশকেই ঢাকায় বসবাস করতে হয়। এছাড়াও মানসম্মত শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদির পর্যাপ্ত সুযোগ না থাকায় যেসব

কর্মকর্তা ঢাকার বাইরে কর্মরত তাদের পরিবার পরিজনও সাধারণত ঢাকায় বসবাস করে। দ্বিতীয়ত, পল্লী অঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত, তাই জীবন-জীবিকার সন্ধানেও মানুষকে ঢাকামুখী হতে হয়।

তাই ঢাকা মহানগরকে বিভক্ত করে রাজধানীর ওপর জনসংখ্যার চাপ কমানো যাবে না। এর জন্য প্রয়োজন হবে একটি বলিষ্ঠ গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচি। আরও প্রয়োজন হবে কৃষি ও পল্লী জীবনে সত্যিকারের গতিশীলতা আনয়ন, যা করতে বর্তমান সরকার তাদের দিনবদলের সনদে অঙ্গীকারাবদ্ধ। পল্লী এলাকার জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন বেগবান করতে হলে অবশ্য প্রয়োজন হবে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও কার্যকর করা, যা করতে বর্তমান সরকারসহ অতীতের সব সরকারই ব্যর্থ হয়েছে। বস্তুত গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতি একের পর এক সরকারের বিমাতাসুলভ আচরণের কারণেই পল্লী এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই বললেই চলে। তাই ঢাকা সিটি করপোরেশনকে বিভক্ত করে বাড়তি জনসংখ্যার সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা 'পেট ব্যথার জন্য মাথা কেটে ফেলা'র সমতুল্য সমাধানই হবে।

দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়নের সমস্যা ঢাকা মহানগরে ব্যাপক। দুর্নীতি প্রতিরোধে পদ্ধতি ও কাঠামোর পরিবর্তন এবং দল নির্বিশেষে দুর্নীতিবাজদের কঠোর শাস্তির বিধান ব্যতীত ঢাকা মহানগরকে বিভক্ত করে কীভাবে দুর্নীতির মূলোৎপাটন করা যাবে তা আমাদের কাছে বোধগম্য নয়। তাই ঢাকাকে বিভক্ত করার পক্ষে এ যুক্তিও ধোপে টেকে না।

আমাদের কাছে আরও বোধগম্য নয় ঢাকা মহানগরকে বিভক্ত করে কীভাবে সেবার মান ও পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাবে। কারণ এর জন্য প্রয়োজন হবে দুর্নীতির মূলোৎপাটন, সেবা প্রদানে দক্ষতা বৃদ্ধি, ট্যাক্স আদায়ে কার্যকর কর্মসূচি, করপোরেশন পরিচালনায় পেশাদারিত্ব ইত্যাদি। এর জন্য আরও প্রয়োজন হবে করপোরেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সরকারের অযাচিত খবরদারিত্বের অবসান। আর ঢাকা মহানগরকে বিভক্ত করলেই এগুলো অর্জিত হবে না। এছাড়াও বিভক্তির ফলে ঢাকা উত্তরের আয় কমে যাবে বলে অনেকের ধারণা, ফলে ওই এলাকার জনগণের সেবার পরিমাণ কমে যেতে পারে।

উপরন্তু, বিভক্তির কারণে সেবা প্রদানের ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনাও দেখা দেবে। কারণ এর ফলে দু'টি সিটি করপোরেশন চালাতে হবে এবং প্রশাসনিক ব্যয় বেড়ে যাবে। 'ইকনমিস অফ স্কেল' অর্জন বা সর্বাধিক নিু খরচে উৎপাদনের জন্য শিল্প কারখানার যেমন একটি 'অপটিমাম' বা যথার্থ সাইজ থাকে, তেমনিভাবে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রেও তা সত্য। তাই বিভক্তির মাধ্যমে সিটি করপোরেশনের 'ডেপ্টথ্ ও ব্রেডথ্' কমে এর আয়তন 'অপটিমাম' সাইজের নীচে চলে যেতে পারে।

ঢাকা মহানগরকে বিভক্ত করার বিরুদ্ধে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আবেগী ও আইনী যুক্তিও রয়েছে। যেমন, অবিভক্ত ঢাকার একটি গৌরবময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে। অনেকে মনে করেন, ঢাকাকে বিভক্ত করলে ওই ঐতিহ্য জলাঞ্জলি দেওয়া হবে। আর সংবিধানের ৫(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ঢাকা আমাদের রাজধানী। ঢাকাকে বিভক্ত করলে প্রশ্ন দেখা দেবে, কোন ঢাকা আমাদের রাজধানী – উত্তর, না দক্ষিণ ঢাকা? তাই অনেকের মতে আমাদের সংবিধান সংশোধন না করে ঢাকাকে বিভক্ত করা যাবে না।

আবার অনেকে মনে করেন যে, ঢাকাকে বিভক্তি করা হয়েছে একটি 'অসৎ' উদ্দেশ্য নিয়ে। সরকারের উদ্দেশ্য নির্বাচন না দিয়ে – নির্বাচন কমিশনের সব আয়োজন সত্ত্বেও অতীতে সরকার নির্বাচন দিতে রাজি হয়নি – মেয়াদোত্তীর্ণ মেয়র সাদেক হোসেন খোকাকে অপসারণ করা, যা বিদ্যমান আইনের অধীনে করা যায় না। কারণ বর্তমান সিটি করপোরেশন আইনে বিরাজমান করপোরেশনের জন্য প্রশাসক নিয়োগের কোনো বিধান নেই। তাই সরকার যা সরাসরি করতে পারে না, তা-ই আইন সংশোধনের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে করার চেষ্টা হচ্ছে, যা আইনসিদ্ধ নয়। এধরনের আইনকে রঙিন বা বিকৃত আইন (colourable legislation) বলা হয়।

এছাড়াও বিখ্যাত *কুদরত-ই-এলাহী পনির বনাম বাংলাদেশ* মামলার সর্বসম্মত রায়ে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ বলেন, "যদি সরকারি কর্মকর্তা বা তাদের তল্পিবহদের কোনো প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় জড়িত করা হয়, তাহলে সেগুলোকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাখার কোনো যৌক্তিকতা নেই।" অর্থাৎ অনির্বাচিত ব্যক্তিদের দিয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান পরিচালনার বিরুদ্ধে আদালত সুস্পষ্ট অবস্থান নিয়েছে।

আরেক কারণেও সিদ্ধান্তটি প্রশ্নবিদ্ধ। ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক জাতীয় নির্বাচনে প্রার্থীদের তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক করে রায় প্রদানের পর ভারতীয় আইনসভা নির্বাচনী আইন সংশোধন করে আদলতের রায় ভণ্ডুল করার উদ্যোগ নেয়। সেই সংশোধনী চ্যালেঞ্জ করে মামলার রায়ে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট সুস্পষ্টভাবে বলেন, "আইনসভার আদালতের রায় পর্যালোচনা এবং তা ভণ্ডুল করার কোনো অধিকার নেই ... আইনসভা আদালতের রায় বাধ্যতামূলক নয়, বাতিল এবং অকার্যকর বলতে পারে না" [*পিপলস্ ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিস বনাম ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া (২০০৩) ৪ এসসিসি*]।

আমরা মনে করি যে, ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের এ রায় আমাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এছাড়াও প্রস্তাবিত সংশোধনীতে সরকারি কর্মকর্তার বাইরে যেকোনো 'উপযুক্ত' ব্যক্তিকে প্রশাসক নিয়োগের বিধান করা হয়েছে, যার ফলে মেয়াদোত্তীর্ণ বিরোধী দলীয় মেয়রকে বাদ দিয়ে দলীয় ব্যক্তিদের ফায়দা হিসেবে প্রশাসকের পদ দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যদিও এ আশঙ্কা জেলা পরিষদের ব্যাপারে সত্যি হলেও, সিটি করপোরেশনের ব্যাপারে তা হয়নি।

পরিশেষে, এটি সুস্পষ্ট যে, দলীয় ব্যক্তিদের জেলা পরিষদে প্রশাসক নিয়োগ করে সরকার একটি মস্তবড় ভুল করল, যার নেতিবাচক প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী। ব্যক্তিবিশেষের জন্য সুসংবাদ বহন করে আনলেও, এটি আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য সুফল বয়ে আনবে না, ক্ষমতাসীন দলের জন্যও না। একইসঙ্গে উপজেলা পরিষদ আইনের সংশোধন করে সরকার সমস্যার সমাধানের পরিবর্তে সমস্যাকে আরও প্রকট করেছে। ঢাকা সিটি করপোরেশনের বিভক্তিও একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সিদ্ধান্ত হয়নি। এসব অজনপ্রিয় সিদ্ধান্তের মাশুল শুধু বর্তমান সরকারকেই নয়, পুরো জাতিকেই হয়তো ভবিষ্যতে গুণতে হবে।